অচেনা রবীন্দ্রনাথ

- কল্যাণ কুমার দাশগুপ্ত

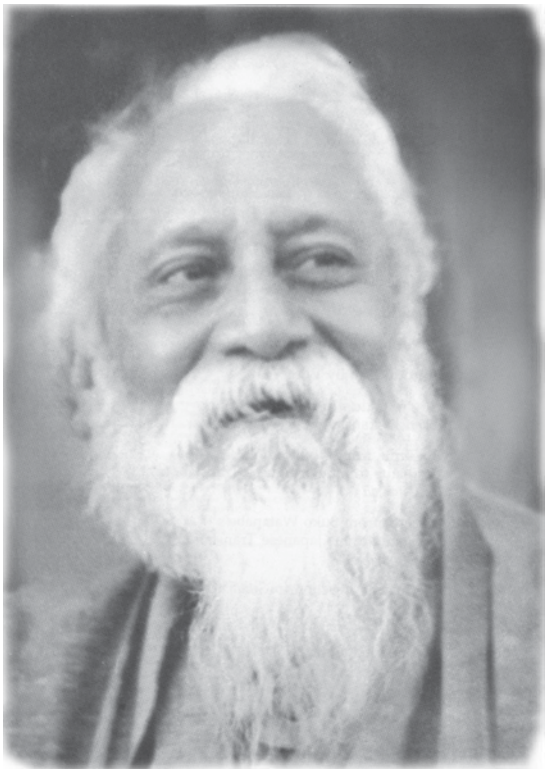

রবীন্দ্রনাথ কি সত্যিই আমাদের অচেনা ?

আমরা যারা বাংলা ভাষায় কথা বলি, বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুঁজে পাই, রবীন্দ্র সাহিত্যে অবগাহন করে মনে-প্রাণে অসীম তৃপ্তি পাই, তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ তো পরম আপনজন। তাঁকে নতুন করে চিনতে হবে কেন ? তবু, আমরা কি বলতে পারি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণভাবে চিনেছি ?

যতবার তাঁর সাহিত্যে ডুবে যাই ততবারই কি তাঁর নতুন পরিচয় পাই না ?

আমার রবীন্দ্রনাথ

আমি তাঁকে ও তাঁর শান্তিনিকেতনকে কতটুকু চিনেছি -- কতটা চেনা এখনও বাকি, সেই প্রসঙ্গে অল্প কিছু বলতে চাই। আমার জন্ম শান্তিনিকেতনে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ২৩শে বৈশাখ তারিখে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন প্রায় ৭০। আমার মাতামহ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী তাঁর অত্যন্ত আপনজন। আমরা ভাইবোনেরা জন্মেছি ক্ষিতিমোহনের গুরুপল্লীর খড়ের চালের বাড়িতে। বাড়িটার দেওয়াল মাটির। উঠোন গোবর দিয়ে সযত্নে নিকোনো। সেই বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন। অনেক সময় হেঁটেই আসতেন। দূর থেকে সুপুরুষটির দেখা পেলে আমরা সানন্দে তাঁর আগমনবার্তা ঘোষণা করতাম। দক্ষিণের বারান্দায় দাদামশাইয়ের সঙ্গে তাঁর কত কি কথা হত। বিষয়বস্তু সেদিনের বালকের অবোধ্য। শুনেছি আমার জন্মের পর তিনি এসেছিলেন নবজাতককে দেখতে, আমাকে দর্শনপ্রার্থী হতে হয় নি। শৈশব ও বাল্যবয়সের বেশ কিছু স্মৃতি আমার সারা জীবনের সম্পদ। তিনি যে একজন যুগপুরুষ সে কথাতো বুঝি নি -- বুঝবার বয়সও হয়নি তখন।

সেদিনের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

উত্তরায়ণের কোনও না কোনও বাড়িতে তিনি থেকেছেন -- কখনও উদয়ন, কখনও শ্যামলী, কখনও পুনশ্চ, কখনও উদীচী। যে বাড়িতেই থেকেছেন একটি বিশেষ ঘরে বসে সারাদিন কত কি যে লিখে চলতেন, কেন লিখতেন কিছুই বুঝিনি। আমাদের কাছে তিনি নিতান্ত আপনার মানুষ, তার বেশি কিছু নয়। সবাই তাঁকে গুরুদেব বলেন। আমরাও গুরুদেবই বলতাম। কেন বলতাম সেকথা তো বুঝি নি। তাঁর লেখার ঘরের বাইরে কোনও প্রহরী নজরদারী করতেন না। আমাদের জন্য দ্বার ছিল অবারিত। এ ব্যাপারে মানুষ রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ প্রশ্রয়ের পরিচয় পেতাম এবং সেই কাঁচা বয়সে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারতাম তিনিও আমাদের সাহচর্য চান। আমরাও তাঁর সাহিত্যের রসদ -- তাঁর সাহিত্যের অনুপ্রেরণা।

আমার আগ্রহ

অল্প বয়সে স্ট্যাম্প জমাবার আগ্রহ ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় প্রতিদিন তাঁর কাছে চিঠি আসত। ডাকঘরে চিঠি সর্টিং-এর সময় দাঁড়িয়ে থাকতাম। জেনে নিতাম বিদেশ থেকে আমাদের গুরুদেবের নামে কটা চিঠি এল। ডাকঘর থেকে উত্তরায়ণের পথ সামান্যই। ডাকপিওনের পিছনে পিছনে পৌঁছে যেতাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। স্ট্যাম্প তো পেতামই -- উপরি পাওনা লজেন্স বা টফি। মহানন্দে ফিরে আসতাম। তাঁর সাহিত্যচর্চায় বিঘ্ন ঘটাতাম না। খাওয়ার ব্যাপারে তিনি বেশ সৌখিন ছিলেন। প্রাতঃরাশের জন্য নানারকমের সুস্বাদু খাবার এসে যেত নির্দিষ্ট সময়ে। সময়টি জানা ছিল। আমার মত আরও কিছু হ্যাংলা বালক জুটে যেত। নানারকম খাবারের মধ্যে তিনি একটি বা দুটি তুলে নিতেন। বাকি খাবারের ভাগ পেতাম। আমাদের খাইয়ে তিনি নিজেও যেন তৃপ্তি পেতেন -- দাড়িগোঁফের আড়ালে স্মিত হাসি ঠিক চেনা যেত।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শান্তিনিকেতনে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রিয় পাঠভবনকে ঘিরেই তো সেদিনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শুরু সেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর একে একে এল শিক্ষাভবন (কলেজ), কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন। পাঠভবন স্কুলের ছাত্ররা তিনভাগে বিভক্ত -- শিশু বিভাগ, মধ্যবিভাগ , আদ্যবিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন সম্পাদক ও একজন সম্পাদিকা নির্বাচিত হতেন। সেই শিশু বয়সেই আমরা গণতান্ত্রিক প্রথায় নির্বাচনের স্বাদ পেয়েছি। স্বাধীনতা ও তৎপরবর্তী গণতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র তখনও অনেক দূরে। প্রত্যেক বিভাগের সম্পাদক ও সম্পাদিকা ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে

লেখা সংগ্রহ করতেন এবং সেগুলির মূল্যায়নও করতেন। অবশ্য এজন্য প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন শিক্ষক এই কাজে সাহায্য করতেন। মনোনীত লেখা মাসে একটি সাহিত্য সভায় পড়া হত। কেউ গান গাইতেন, কেউ আবৃত্তি করতেন, কেউ পড়তেন স্বরচিত কবিতা ও রচনা। এরপর থাকত সাধারণের বক্তব্য। সভায় উপস্থিত যে কেউ সভায় পঠিত রচনা, কবিতা বা গানের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে পারতেন। প্রত্যেক সভায় একজন সভাপতি থাকতেন। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য। আমাদের ছুটি থাকত বুধবার (রবিবার নয়)। বৃহস্পতিবার কর্মারম্ভ। প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একেকটি বিভাগের সভা হত। সভার নোটিশ আশ্রমের সবার বাড়িতে গিয়ে সকলের সই করিয়ে নিয়ে আসা হত। এছাড়া একটি বিশেষ দেওয়ালের সাথে গাঁথা বোর্ডে চক দিয়ে লিখে সভার কথা আগাম জানানো হত। সেই নোটিশ কারও নজর এড়াতে পারে, সেজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রমের সবাইকে নিমন্ত্রণ করে আসতাম। অবশ্যই তখন আশ্রম এত বড় ছিল না। তবে বাড়ি বাড়ি নোটিশ দেখাতে দুটো দিন লাগতই। সব বাড়ি ঘুরতে মোট পাঁচ ছয় মাইল হাঁটতে হত। সাহিত্য সভায় সাধারণের বক্তব্য ও সভাপতির বক্তব্যের মাধ্যমে ক্ষুদে লেখকরা সমালোচনা হজম করতে শিখত, সমালোচনা করতেও শিখত। অল্পবয়স থেকে সাহিত্য রচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে বুনিয়াদ পাকা হত। তিন বিভাগের সাহিত্য সভা মাসের তিনটি মঙ্গলবারে হত। চতুর্থ মঙ্গলবারে সাহিত্যিকদের সাহিত্য সভা, পাঠভবন ছাড়া অন্যান্য বিভাগের (শিক্ষাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, চীনাভবন, হিন্দিভবন) ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য সভা হত। আমাদের পাঠভবনে ছাত্রাবস্থায় (গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে) মহাশ্বেতা দেবী ছোটগল্পে হাত পাকাচ্ছেন। নবকান্ত বরুয়া তখন বাংলায় কবিতা লিখতেন। এমনি একটি সভায় হীরেন দত্ত সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ও সুসাহিত্যিক। হীরেনদা নবকান্তকে বলেছিলেন -- মধুসূদন দত্ত ইংরেজী সাহিত্যে ছাপ ফেলতে পারেননি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে নতুন জোয়ার আনতে পেরেছিলেন। তাঁর মাতৃভাষা বাংলাভাষা আজ যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নবকান্ত প্রতিভাবান। তিনি যদি অহমিয়া ভাষায় কাব্য রচনা করেন, হয়তো অহমিয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে। নবকান্ত বরুয়া এরপর অহমিয়া ভাষায় লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক হয়ে পদ্মভূষণে ভূষিত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষে কলকাতায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনার আগে তিনি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তাঁকে আমি সেদিনের কথা স্মরণ করিয়ে গুরুঋণ শোধের সুযোগ নিতে বলি। তিনি সংবর্ধনা সভায় হীরেনদা-র কথা বলেছিলেন। খবরের কাগজে সে খবর ছাপা হয়েছিল। তখনও হীরেনদা জীবিত। তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন।

সাহিত্য সভা ছাড়াও প্রায়ই অনুষ্ঠিত হত নাটক বা নৃত্যনাট্য। রঙ্গমঞ্চের একপাশে রবীন্দ্রনাথ বসতেন। পিছনে গানের দল বসত। অনুষ্ঠানের আগে প্রায় একমাস মহড়া চলত উত্তরায়ণে। মহড়ায় রবীন্দ্রনাথ সাগ্রহে উপস্থিত থাকতেন। আমরা তো থাকতামই। এছাড়া প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের ডাক পেয়ে আশ্রমের সকলে উদয়নের হল ঘরে জড়ো হতাম। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন লেখা পড়ে শোনাতেন। আমরাই তাঁর রচনার প্রথম শ্রোতা। এরপর রবীন্দ্রনাথ সেদিনের উঠতি গায়ক গায়িকাদের নাম করে গান গাইতে বলতেন। সেদিনের কিশোরী মোহরদি (কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়), বাচ্চুদি (নীলিমা সেন) ও আরও অনেকেই গান শোনাতেন। তখন তাঁর সুরের কাণ্ডারী দীনু ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের রচনা শুনে কিছু বুঝতাম কি ? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া কঠিন। কিছু বোঝা ও না বোঝার মধ্যেও প্রাণটা কানায় কানায় ভরে উঠত।

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের দাবদাহ

শান্তিনিকেতনে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কতটা ওঠে সেটা তাঁরাই বুঝবেন যাঁরা সেই সময়ে শান্তিনিকেতনে থেকেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর জন্মোৎসব ২৫শে বৈশাখের পরিবর্তে ১লা বৈশাখ পালন করা হত। জন্মদিনে তিনি প্রিয় ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি চাইতেন, কিন্তু তাঁদের গরমে কষ্ট পেতে দিতেন না। গ্রীষ্মকালে জলের নিতান্তই অভাব। তখনও গভীর নলকূপের সন্ধান মেলেনি। গ্রীষ্মকালে প্রায় সব কুয়ো শুকিয়ে যেত। আজকের মত কল খুললেই জলের কথা আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। আমরা সবাই কুয়োপারে স্নান করতাম। খাওয়ার জল কুয়োপার থেকে টেনে আনতাম। শিক্ষকরাও তাই করতেন। বেতন পেতেন সামান্যই, চাকর রাখার সাধ্য ছিল না। তবু তাঁরা পরম আনন্দে আর্থিক অভাবের মধ্যে দিন কাটাতেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ২০ বছর পর তাঁর জন্ম শতবার্ষিকীর সময় গভীর নলকূপের সন্ধান মিলল। সেদিনের বিশ্বভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের ছাত্র। স্বাধীন ভারতে তিনিই সুপ্রীম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। সেদিনের পাঞ্জাবের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রোঁর যোগ্যতার খ্যাতি থাকলেও কিছু অনাচারের বদনাম হয়। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের নির্দ্দেশে সুধীদাই অভিযোগ অনুসন্ধান করেন, এবং কায়রোঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এহেন খ্যাতিমান সুধীরঞ্জন দাশ সেই ১৯৬১তে আমার মত নিতান্ত নগণ্য মানুষকেও আলাদা চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে গভীর নলকূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। চিঠিতে তাঁর আন্তরিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যাবে জলের সন্ধান শান্তিনিকেতনের উন্নয়নে কতটা আবশ্যিক ছিল।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জন্মদিন

মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ১লা বৈশাখে শান্তিনিকেতনে তাঁর জন্মোৎসব পালন করা হচ্ছিল। অনুষ্ঠানটি উত্তরায়ণ চত্বরে উদয়নের সামনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান শেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্যরচিত "সভ্যতার সংকট" পড়তে উঠলেন। অল্প পরেই তিনি উত্তেজিত ও অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুস্তিকাটির শেষ অংশ তাঁর হয়ে পড়ে দিলেন আমার দাদামশাই ক্ষিতিমোহন। সভ্যতার সংকটের সব কথা কি সেদিন বুঝেছিলাম ? অনেক কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলাম সামনে ঘোর দুর্দিন। আজ সভ্যতার যে নতুন সংকট দেখতে পাচ্ছি তার খবর রবীন্দ্রনাথ পাননি। কিন্তু ঋষির দূরদৃষ্টিতে তিনি আগামী যুগের ঘোর সংকটের পূর্বাভাস অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং বিশ্ববাসীকে সাবধান করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ বিদায়

রবীন্দ্রনাথের বিয়োগ ব্যথায় সারা ভারতবর্ষ যখন মুহ্যমান তখন এই ঘটনা আমাদের মত বালকের মনে কতটা রেখাপাত করেছিল ? নিতান্ত প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের জন্য আমাদের গুরুদেবকে কলকাতায় যেতেই হবে, আশ্রমবাসীদের মনে অজানা সংশয়। যতদূর মনে পড়ে ১৯৪১এর জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহে তিনি শান্তিনিকেতন ছেড়ে

চলে গেলেন। সমস্ত আশ্রমবাসী উত্তরায়ন থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। অনিশ্চিতের আশংকার প্রতিফলন পড়েছে তাদের চোখে মুখে। শান্তিনিকেতন ছাড়বার আগে তাঁর প্রিয় আশ্রম ঘুরে দেখবেন -- গাড়ী চলেছে ধীর গতিতে। আশ্রমবাসীদের মনের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা তাঁদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে -- রবীন্দ্রনাথের চোখও একটু যেন ছল্‌ছলে। তখন বোলপুর ও শান্তিনিকেতনের মাঝামাঝি ভুবনডাঙ্গা গ্রামের কাছে একটা বড় জেনারেটার বসানো হচ্ছে, উদ্দেশ্য সন্ধ্যা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের রাস্তায় আলো জ্বলবে। শান্তিনিকেতনবাসীরা তখন বিজলি বাতির কথা ভাবতেও পারেন না। আমাদের পাঠভবনের পাঠ লন্ঠনের আলোয়, তাও একটা লন্ঠনে একাধিক ভাইবোন পড়েছি। রাস্তায় আলো দেওয়ার জন্য ইলেকট্রিক পোস্ট বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। পোস্টগুলির দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন নতুন আলো আসছে -- পুরোনো আলো নিভবে। তাঁর মন কি বলছিল -- এই যাত্রাই শেষ যাত্রা ? পথের দুপাশে আমরা দাঁড়িয়ে, অনেকেরই চোখে জল। শান্তিনিকেতনের কিছু প্রশাসনিক পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমার দাদামশাই রবীন্দ্রনাথকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। রবীন্দ্রনাথের উত্তর -- পাখি ডানা মেলে দিয়েছে, সে ডানাতে আর জল লাগাতে বলবেন না।

১৫ দিন পর পরম দুঃসংবাদ নিয়ে সেদিনের ইংরেজী শিক্ষক ক্ষিরিশ চন্দ্র রায় এলেন। প্রায় ১ ঘন্টা তিনি ও আমার মাতামহ নিঃশব্দে বসে রইলেন। তারপর শান্তিনিকেতনে আশু করণীয় কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়। কলকাতা থেকে দুটি ভস্মাধারে তাঁর দেহভস্ম নিয়ে যখন আশ্রমে ঢোকা হল তখন আরও একবার রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আশ্রমিকেরা। ভস্মাধারটি উদয়নে তাঁর বহু ব্যবহৃত চেয়ারে রাখা হল। ওই চেয়ারের অন্য পাশে রাখা হল তাঁর "শূন্য কেদারা" কবিতাটি। তাঁর মরদেহ তো পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর অমর প্রাণ আজও আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি আমাদের কাছেই আছেন। যতদিন বাংলা ভাষা বেঁচে থাকবে ততদিন রবীন্দ্রনাথ অমর। তাঁর জন্মের পর ১৫০ বছর পেরিয়ে এলাম --মৃত্যুর পরেও ৭০ বছর হতে চললো, তবু তাঁর লেখা একটুও পুরোনো হয়নি। তাঁর মানুষের ধর্ম আজও আমাদের একই ভাবে টানে। ❑

শান্তিনিকেতন কী –

এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে কেবল আমার চোখে দেখার সম্বন্ধ নয়, একে আমার জীবনের সাধনা দিয়ে পেয়েছি -- সেইজন্যে এইখানে আমি সকল তীর্থের ফল লাভ করি।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথম চৌধুরীকে লেখা চিঠি)